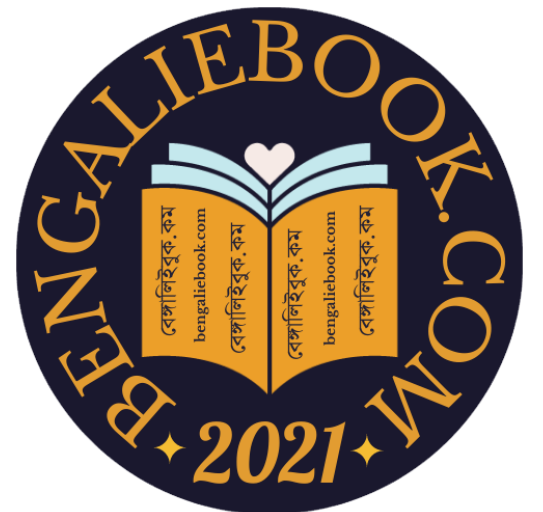


প্রোফেসর শঙ্কু

ডন ফ্রিষ্টোবান্ডির

অবিশ্বাস্যতা

সত্যজিৎ রায়



ডন ক্রিস্টোবাল্ডির ভবিষ্যদ্বাণী (প্রোফেসর শঙ্কু)

সেপ্টেম্বর ৬

আজ আমার বন্ধু জেরেমি সন্ডার্সের কাছ থেকে একটা আশ্চর্য চিঠি পেয়েছি। সেটা হল এই— প্রিয় শঙ্কু,

তোমাকে একটা অদ্ভুত খবর দেবার জন্য এই চিঠির অবতারণা। আমাদের দেশের কাগজে খবরটা বেরিয়েছে, কিন্তু ভারতবর্ষে হয়তো বেরোয়নি। ম্যাডিডের এক লাইব্রেরিতে একটি অতি প্রাচীন পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়েছিল তিন মাস আগে। স্পেনের বিখ্যাত ভাষাবিদ প্রোফেসর আলিফোনসো বেরেটা তিন মাসে এই পাণ্ডুলিপির পাঠোদ্ধার করেছেন এবং একটি সাংবাদিক সম্মেলনে সেটা সম্বন্ধে বলেছেন। এই পাণ্ডুলিপির লেখকের নাম হল ডন ক্রিস্টোবাল্ডি এবং এর রচনাকাল হল ১৪৮৩ থেকে ১৪৯০। অর্থাৎ আজ থেকে পাঁচশো বছর আগে। বেরেটা বলেছেন, এই পাণ্ডুলিপিতে ক্রিস্টোবাল্ডি অজস্র ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন, যার অধিকাংশই ফলে গেছে। তুমি তো ফরাসি গণিতকার নষ্ট্রাডামুসের কথা জানো। নষ্ট্রাডামুস জন্মেছিলেন ১৫০৩ খ্রিস্টাব্দে, এবং তিনিও পদে বহু ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন, যার অনেকগুলোই ফলে গেছে। লন্ডনের প্লেগ ও অগ্নিকাণ্ড, ফরাসি বিপ্লবে সম্রাট ষোড়শ লুইয়ের লাঞ্ছনা, নেপোলিয়নের উত্থান ও পতন, লুই পাস্তুরের যুগান্তকারী আবিষ্কার, এমনকী আমাদের যুগে হিরোশিমা ও নাগাসাকির উপর আণবিক বোমা বর্ষণ, অষ্টম এডওয়ার্ডের সিংহাসনত্যাগ, হিটলারের অভ্যুত্থান ইত্যাদি অনেক কিছুই নষ্ট্রাডামুস সঠিকভাবে বর্ণনা করে গিয়েছিলেন। কিন্তু এই স্প্যানিশ পাণ্ডুলিপিতে যা ভবিষ্যদ্বাণী আছে, তা নষ্ট্রাডামুসের কীর্তিকে স্নান করে দেয়। গত পাঁচশো বছরে এমন কোনও বিখ্যাত ঐতিহাসিক ঘটনা নেই যা ক্রিস্টোবাল্ডি তাঁর দিব্যদৃষ্টি দিয়ে প্রত্যক্ষ করেননি। আমার তো বিশ্বাস, তোমার কথাও তিনি বলে গেছেন : বিংশ শতাব্দীতে এক অসাধারণ প্রতিভাশালী বিজ্ঞানীর আবির্ভাব হবে যার নামের আদ্যক্ষর এস-এ তুমি ছাড়া আর কে হতে পারে?

আমি ম্যাড্রিডে গিয়ে বেরেটার সঙ্গে দেখা করি এবং এই পাণ্ডুলিপি নিয়ে আলোচনা করি। আমার এই চিঠি লেখার প্রধান কারণ হল ক্রিস্টোবাল্ডির একটি বিশেষ ভবিষ্যদ্বাণী। তিনি এক জায়গায় লিখেছেন, সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রশান্ত মহাসাগরের একটি দ্বীপে এক প্রাণীর আবির্ভাব হবে, যারা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মাত্র তিনশো বছরে মানুষের কীর্তিকে অনেক গুণে অতিক্রম করে যাবে। মানুষ এই প্রাণীর সন্ধান পাবে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়াধর্চ এবং এই প্রাণী নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার আশঙ্কা মানুষই দূর করবে।

প্রশ্ন হচ্ছে—এই প্রাণী কি সত্যিই আছে? যদি থাকে। তবে তারা কোথেকে এল, এবং একটি দ্বীপে বাস করে তারা এত অল্প সময়ে বিজ্ঞানে কী করে এতদূর অগ্রসর হল?

সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে অনেক বিখ্যাত পর্যটক প্রশান্ত মহাসাগর পরিভ্রমণ করে। অনেক কিছু আবিষ্কার করেন। আমি গত এক মাস ধরে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে গিয়ে এইসব পর্যটকের ভ্রমণবৃত্তান্ত পড়ে দেখেছি। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে ফরাসি পর্যটক জী-ফ্রাঁসোয়া লা পেরুজ প্রশান্ত মহাসাগরে পাড়ি দেন। তার বিবরণ তিনি লিখে গেছেন। সেটা পড়তে পড়তে এক আশ্চর্য ঘটনার বর্ণনা পেলাম। লা পেরুজের জাহাজ একবার ঝড়ে পড়ে কক্ষত্রষ্ট হয়ে একটা অজানা দ্বীপের কাছে এসে পড়ে। তখন সন্ধ্যা। সেই সময় লা পেরুজ এক আশ্চর্য দৃশ্য দেখেন। দ্বীপের একটা অংশ থেকে একটি আলোকস্তম্ভ উঠে আকাশে বহুদূরে চলে গেছে। এর কারণ জানার চেষ্টা লা পেরুজ করেননি, কারণ ঝড় থেমে যাওয়ায় তাঁরা আবার কক্ষে ফিরে আসেন।

আলোকস্তম্ভের বর্ণনা পড়লে লেসার রশ্মির কথাই মনে পড়ে। অন্য কোনও আলো এই ধরনের সমান্তরাল স্তম্ভ রচনা করতে পারে না। ভেবে দেখো—এই ঘটনা একশো বছর। আগে দেখা, আর মানুষের লেসার রশ্মি আবিষ্কার হল সাম্প্রতিক ঘটনা!

আমার প্রবল আগ্রহ হচ্ছে এই দ্বীপে গিয়ে অনুসন্ধান করার। আমার কেন জানি মনে হচ্ছে, এই প্রাণী সম্পর্কেও ক্রিস্টোবাল্ডির গণনা নির্ভুল। আমাদের মনরো দ্বীপ অভিযানে,

আমরা যে যান ব্যবহার করেছিলাম-আমাদের জাপানি বন্ধু হিদেচি সুমা-র তৈরি জেটচালিত সুমাইক্রোফট-সেই একই যান আমরা এবারও ব্যবহার করতে পারি। সুমাকে বললে ও রাজি হবে না। এটা আমার বিশ্বাস হয় না। আর ক্রোল তো পা বাড়িয়েই আছে; এখন বাকি শুধু তোমার সম্মতি। তোমাকে তো চিনি আমি সতেরো বছর ধরে; আমার দৃঢ় বিশ্বাস তুমি রাজি হবে।

কী স্থির কর অবিলম্বে জানাও, কারণ অনেকরকম তোড়জোড় আছে। শুভেচ্ছা নিও।

ইতি। জেরেমি

এ ব্যাপারে যে আমার উৎসাহ না হয়ে যায় না, সেটা সম্ভার্স ঠিকই বলেছে। সত্যিই কি এই উন্নতস্তরের প্রাণী, যারা মানুষ নয়, তারা পৃথিবীতে বাস করছে এতদিন ধরে? ডন ক্রিস্টোবাল্ডির এই গণনাও কি নির্ভুল?

আমি এই অভিযানে যোগ দিতে অবশ্যই প্রস্তুত, সে খবর আমি সম্ভার্সকে আজই জানিয়ে

সেপ্টেম্বর ১৩

অভিযানের সমস্ত আয়োজন হয়ে গেছে। সুমা এককথায় রাজি। তার যানই আমরা ব্যবহার করছি, তবে এটা আগেরটার চেয়ে আরও উন্নত ধরনের যান-সুমাক্রোফট ২।

আমরা চার জন ছাড়া আরেকজন আমাদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন। ইনি হলেন বার্সেলোনার বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক প্রোফেসর সালভাদর সাবাটিনি। এর সঙ্গে আমার একবারই দেখা হয়েছিল ব্রাসেলসের এক বিজ্ঞানী সম্মেলনে। বয়স ষাটের বেশি নয়, পণ্ডিত ব্যক্তি তাতে সন্দেহ নেই, তবে কিঞ্চিৎ দান্তিক আর একওঁয়ে। ইনি অভিজাত বংশের সন্তান, তবে এখন অবস্থা অনেক পড়ে গেছে। ক্রিস্টোবাল্ডির পুঁথি ইনি পড়েছেন,

এবং মজার ব্যাপার হচ্ছে যে এর ধারণা এস নামধারী যে বিজ্ঞানী প্রবারের কথা ক্রিস্টোবান্ডি বলে গেছেন, তিনি হলেন উনি নিজে।

আমরা সকলে সিঙ্গাপুরে একত্র হব, তারপর সেখান থেকে রওনা। লা পেরুজের সঙ্গে ক্রোনোমিটার ইত্যাদি নানারকম যন্ত্র ছিল, তাই তিনি এই রহস্যময় দ্বীপের অবস্থান দিয়ে গেছেন। সেটা হল ৪১-২৪ নর্থ বাই ১৬১-৫ ওয়েস্ট। ম্যাপে দেখা যাবে ওখানে কোনও দ্বীপের চিহ্ন নেই। সেটাই অবশ্য স্বাভাবিক।

আমরা ২৫শে সেপ্টেম্বর রওনা হচ্ছি।

সেপ্টেম্বর ২৪, সিঙ্গাপুর

আমরা এখানে জমায়েত হয়েছি গতকাল। সাবাটিনির কাছে ক্রিস্টোবান্ডির পুঁথির কথা শুনছিলাম। পুঁথির গোড়াতে ক্রিস্টোবান্ডি তার নিজের সম্বন্ধে বেশ কিছুটা বলেছে। মেষপালকের ছেলে ছিল সে। তেরো বছর বয়সে সে প্রথম ভবিষ্যতের ঘটনার ইঙ্গিত পায়। তার কথা অবশ্য সকলেই হেসে উড়িয়ে দিয়েছিল। তারপর একের পর এক অজস্র ভবিষ্যতের ঘটনা তার চোখের সামনে ভেসে উঠতে থাকে। সে নিজের চেষ্টায় লিখতে পড়তে শেখে শুধু এইসব ঘটনা লিখে রাখার জন্য। নষ্ট্রাডামুসের মতোই সে নিজের মৃত্যুর সন। তারিখও আগে থেকে জানিয়ে গিয়েছিল। ১৯৪৩-এর-বাংলার মন্বন্তরের কথা ক্রিস্টোবান্ডি লিখে গেছে। বাংলার নাম অবশ্য করেনি; প্রাচ্যের একটা প্রদেশ বলে বলেছে। সেই সময় যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলেছে, তার সম্বন্ধেও অবিশ্যি অনেক তথ্য আছে। হিটলারের কনসেনট্রেশন ক্যাম্পও বাদ যায়নি।

সুমা জিজ্ঞেস করল জাপান সম্বন্ধে কোনও ভবিষ্যদ্বাণী আছে কি না। তাতে সাবাটিনি বলল, তোমাদের রাজা হিরোহিতো সম্বন্ধে একেবারে নাম উল্লেখ করে বলা আছে। তিনি যে দীর্ঘকাল জীবিত থাকবেন সে কথাও বলা আছে। তা ছাড়া হিরোশিমা নাগাসাকির কথা তো আছেই। যেমন নষ্ট্রাডামুসে ছিল।

সুমা দেখলাম, এই নতুন প্রাণীর ব্যাপারে একটু সন্দিহান। বলল, মানুষ এই বিংশ শতাব্দীতে যা করেছে, এই পৃথিবীতেই কোনও প্রাণী তার চেয়ে বেশি উন্নত কিছু করতে পারবে এটা আমার বিশ্বাস হয় না। সভার্স আর ক্রোল দুজনেই এ ব্যাপারে যাকে বলে ওপান-মাইন্ডেড। ক্রোল বলছে, এই প্রাণী যদি থেকেও থাকে, তা হলে আমি প্রথমেই অনুসন্ধান করব এরা অলৌকিককে বিজ্ঞানের আওতায় এনে ফেলতে পেরেছে কি না। আমাদের অনেক বিজ্ঞানীই অলৌকিক ঘটনাকে হেসে উড়িয়ে দেন, অথচ সেগুলো যে কী করে ঘটছে তার কোনও সন্তোষজনক জবাব দিতে পারেন না।

সভার্সের উৎসাহের অন্ত নেই। ও বারবার বলছে, লা পেরুজ যা লিখে গেছে, তা তো মিথ্যা হতে পারে না। সে ছিল অতি বিখ্যাত পর্যটক। কথা হচ্ছে-সেই প্রাণী এখনও আছে কি না। একটা জিনিস। আমি কিছঁতে ই বুঝতে পারছি না-শুধু একটা দ্বীপে নিজেদের আবদ্ধ রেখে পৃথিবীর অন্য কোনও অংশের সঙ্গে যোগস্থাপন না করে একটা জাত কী করে উন্নত অবস্থায় বেঁচে থাকে। টেকনলজিতে উন্নতি করতে গেলে তো যন্ত্রপাতি লাগে। সেই যন্ত্রপাতি তৈরি করার মালমশলা ওই একটা দ্বীপেই রয়েছে?

এইসব প্রশ্নের কোনও উত্তরই অবশ্য সিঙ্গাপুরে বসে পাওয়া যাবে না। তবে আমার মনেও যে একটা অবিশ্বাস দানা বাঁধেনি। তা নয়। এসব ব্যাপারে ধাপ্লাবাজির উদাহরণের অভাব নেই। আমাদের দিনেরই একজন লোক, যে প্রাচীনকালের হাতের লেখা অনুকরণ করতে পারে, সে মাসখানেক পরিশ্রম করলেই একটা পাঁচশো বছরের পুরনো পাণ্ডুলিপি তৈরি করে ফেলতে পারে। যিনি এই পুঁথি আবিষ্কার করেছেন, তিনি কীরকম লোক সেটা জানা দরকার।

সেপ্টেম্বর ২৭, প্রশান্ত মহাসাগর

আমরা পচিশেই রওনা হয়েছি। সুমার এই যানটির কোনও তুলনা নেই। ম্যাপে দেখে আন্দাজ হয়, আমাদের সাড়ে সাত হাজার মাইলের মতো যেতে হবে। আমরা এখন পর্যন্ত দিনে গড়ে পাঁচশো মাইলের মতো চলেছি। দরকার হলে এর চেয়েও বেশি যাওয়া যায়,

কিন্তু এখন অবধি সেটার কোনও প্রয়োজন বোধ করিনি। সম্ভার্স একটা খেলা নিয়ে এসেছে, নাম লোগোস। যেটা পাঁচ জনে খেলতে পারে। ইংরাজি শব্দ রচনার খেলা, ভেবেছিলাম সুমা আর সাবাটিনির অসুবিধা হবে, কিন্তু দেখছি। এরা ভাষাটা ভাল বলতে না পারলেও, পড়াশুনা করেছে অনেক, ফলে শব্দের স্তবক রীতিমতো ভাল। খেলাটা খেলে আমাদের অনেকটা সময় কেটে যায়।

সুমা সঙ্গে করে একেবারে হালের ইলেকট্রনিক আবিষ্কারের কিছু নমুনা নিয়ে এসেছে। তারমধ্যে একটা খুবই চমকপ্রদ। তুমি হয়তো প্যারিসে গেছ বাজার করতে, অথচ ফরাসি ভাষা জান না। তুমি ইংরাজিতে তোমার চাহিদা জানালে। এই যন্ত্র তৎক্ষণাৎ সেটা ফরাসি

আমাদের ওখানে কতদিন থাকতে হবে জানি না। নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে দশ দিনের মতো জামাকাপড় নিয়ে এসেছি। থাকব। প্লাস্টিকের তাঁবুতে আর খাব টিনের খাবার।

অক্টোবর ৩, প্রশান্ত মহাসাগর
৪০, ১ নর্থ বাই ১৬১-৫ ওয়েস্ট

আজ আধা ঘণ্টা আগে আমরা এই দ্বীপে পৌঁছেছি। আদৌ যে একটা দ্বীপ রয়েছে এই ল্যাটিচিউড, লঙ্গিচিউডে, তাতেই আমরা উৎফুল্ল। বিচিত্র দ্বীপ। কোনও গাছপালা নেই, সবুজ বলতে কিছুই নেই, কেবল বালি, পাথর আর শুকনো মাটি। মশা ছাড়া কোনও প্রাণীর সাক্ষাৎ পাইনি এখন পর্যন্ত। কোনওরকম সরীসৃপও চোখে পড়েনি, পাখি বা জানোয়ার তো নয়ই।

দ্বীপটি কত বড় সেটা এখনও আন্দাজ করতে পারিনি। তবে এটা প্রায় জোর দিয়েই বলা যায় যে, এখানে যদি কোনও প্রাণী থেকেও থাকে, তা হলে সভ্যতার স্তরে তারা বেশ

নীচেই স্থান পাবে। সভ্য মানুষ হলে বাসস্থানের চিহ্ন থাকবে তো! এখানে যতদূর দেখা যায়, একটা বাড়িও চোখে পড়ছে না।

আমাদের সকলেরই মনে একটা আশঙ্কা রয়েছে যে এতদূর এসে হয়তো ব্যর্থ হয়ে ফিরে যেতে হবে। এখন দুপুর দুটো। আজকের দিনটা যে এখানে থাকা উচিত সেটা সকলেই বোধ করছি। দ্বীপটা একটু ঘুরেও দেখা উচিত। দূরের দিকে চাইলে মনে হয় সে অংশটা, আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি তার চেয়ে বেশ খানিকটা উঁচু। এবং মোটামুটি মসৃণও বটে।

এখনও লাঞ্চ হয়নি। ক্রোল আর সভাস মিলাে খাবার আয়োজন করছে; আমারও বোধ হয়হাত লাগানো উচিত। লেখা বন্ধ করি।

অক্টোবর ৫

কথাটা লিখেও আনন্দ; আমাদের অভিযান সফল হয়েছে! এই দুদিনের ঘটনা নিয়ে একটা বই লেখা যায়; আমি ডায়েরিতে যতটা পারি লিখছি।

প্রথম দিন লাঞ্ের পর আমরা পাঁচজন বেরোলাম দ্বীপের মাঝের অংশ লক্ষ্য করে। যত হাটছি তত বুঝছি যে জমিটা ধীরে ধীরে উঁচু হচ্ছে এবং মসৃণ হচ্ছে। নুড়ি, পাথর ইত্যাদিও ক্রমশ কমে আসছে। এই মসৃণতা কিন্তু এমন দ্বীপের এমন জমিতে স্বাভাবিক নয়। সুমা একবার হাঁটা থামিয়ে মাটিতে উপুড় হয়ে বসে জমিটার উপর হাত বুলিয়ে পরীক্ষা করল। ওর মন্তব্য হল, ভেরি স্ট্রেন্ড।

প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট হাঁটার পর একটা জায়গায় এসে পড়লাম, যেটাকে মনে হল দ্বীপের উচ্চতম অংশ। বিশেষ দ্রষ্টব্য হল মাটিতে একটা গোল গর্ত যার ব্যাস আন্দাজ দেড় মিটার। সেটার দিকে এগিয়ে ভাল করে দেখেও বোঝা গেল না তার ভিতর কী আছে। সেটা যে গভীর তাতে সন্দেহ নেই, কারণ চোখে যা দেখা যাচ্ছে তা হল দুর্ভেদ্য

অন্ধকার। ক্রোল আধপাগলা লোক, সে গর্তটার কাছে মুখ নিয়ে তারস্বরে চিৎকার করল, হোয়েহো।

কোনও উত্তর নেই, অথচ বেশ বোঝা যাচ্ছে গর্তটা প্রাকৃতিক নয়; এমন নিখুঁত বৃত্ত মানুষ বা মানুষজাতীয় কোনও প্রাণীর কাজ হতে বাধ্য।

আমরা আরও কিছুদূর এগিয়ে গেলাম। এদিকে জমিটা ক্রমে ঢালু হয়ে নীচে নামছে। আমরা এসেছি। প্রায় চার মাইল। এই গর্ত যদি এই দ্বীপের কেন্দ্রস্থল হয়, তা হলে ওদিকেও আন্দাজ চার মাইল জমি তো রয়েছে।

ঢালুর ওপাশেও আমরা বাসস্থানের কোনও চিহ্ন দেখতে পেলাম না।

কিছুদূর গিয়ে আমরা ফেরার পথ ধরলাম। গর্তটা দেখে সকলেই উত্তেজিত, কিন্তু তার মানে কেউই বুঝতে পারছে না।

ক্যাম্পে ফিরতে ফিরতে পাঁচটা বেজে গেল। এতটা পথ হেঁটে সকলেরই বেশ ক্লান্ত লাগছিল। আমাদের তাঁবুগুলো খাটানো হয়ে গিয়েছিল। তিনটে তাঁবু-একটায় ক্রোল আর সন্ডার্স, একটায় আমি আর সুমা, আর একটায় সাবাটিনি। আমরা যে যার ক্যাম্পে ঢুকে প্লাস্টিকের চাদরে শুয়ে একটু জিরিয়ে নিলাম। সাড়ে পাঁচটায় ক্রোল সকলকে কফি এনে দিল। সাবাটিনির একটা অসুবিধা হচ্ছে, আমাদের মধ্যে একমাত্র ওকেই মশা কামড়াচ্ছে। সে বারবার শরীরের অনাবৃত অংশে চাপড় মেরে মশা মারার চেষ্টা করছে। বলল, আমার রক্তের জাতই এইরকম। আমার দেশেও মশারা আমার রক্ত খেতে খুব ভালবাসে।

সাড়ে ছটায় প্রশান্ত মহাসাগরের দিগন্তে সারা আকাশে রং ছড়িয়ে সূর্যদেব অস্ত গেলেন। এবার অন্ধকার হয়ে যাবে দেখতে দেখতে। আমি তিনটে ক্যাম্পের জন্য আমার তৈরি তিনটে লুমিনিম্যাক্স ল্যাম্প এনেছি।-অন্ধকার হলেই সেগুলো জ্বলবে।

কিন্তু সেই প্রাণীরা যদি থেকেও থাকে, তা হলে কখন তাদের দেখা পাওয়া যাবে? তারা কি আমাদের দেখাই দেবে না? মানুষের প্রতি কি তারা বিরূপ ভাব পোষণ করে?

ক্রোলের তাঁরু থেকে ভেসে আসছে হেঁড়ে গলায় টুকরো টুকরো ভাবে গাওয়া একটা জার্মান গান। সুমা পাশ্চাত্য ক্ল্যাসিক্যাল সংগীতের ভক্ত। সে একটা বেটোফেনের সিমফনির ক্যাসেট বার করে তার যন্ত্রে চাপাতে যাবে এমন সময় একটা চিৎকার শোনা গেল।

কাম আউট অ্যান্ড সী, কাম আউট অ্যান্ড সী!

সাবাটিনির গলা।

আমরা হতুদন্ত হয়ে ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে এক শ্বাসরোধ করা দৃশ্য দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলাম।

দ্বীপের যেটাকে আমরা মাঝের অংশ বলে মনে করেছিলাম, সেখানকার জমি থেকে একটা সবুজ আলোকস্তম্ভ বেরিয়ে আকাশের দিকে বহুদূর উঠে গেছে। এটা যে লেসার রশ্মি তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এই আলোকস্তম্ভই একশো বছর আগে দেখেছিল। লা পেরুজ।

সভার্স বলে উঠল, ইট মাস্ট বি কামিং আউট অব দ্যাট হোল।

আমিও তাই সন্দেহ করছিলাম। ওই গর্ত থেকেই এই আলোকস্তম্ভ বেরিয়েছে।

আমার মনে একটা সন্দেহের উদয় হয়েছিল, সেটা এবার বলে ফেললাম।

আমার মনে হয় এই প্রাণী মাটির নীচে থাকে। তাই বাইরে এদের অস্তিত্বের কোনও চিহ্ন নেই।

কিন্তু এদের সঙ্গে যোগাযোগ করব কীভাবে? অসহিষ্ণু ভাবে বলে উঠল সভার্স।

অ্যান্ড ইন হোয়াট ল্যান্ডুয়েজ? প্রশ্ন করল। সুমা।

ঠিক কথা। এদের তো ইংরিজি জানার কোনও সম্ভাবনা নেই, তা হলে যোগাযোগ হবে ভাবে?

এবার সুমা ক্যাম্প থেকে একটা যন্ত্র নিয়ে এল। একেবারে হালের জাপানি কীর্তি, তাতে সুন্দেহ নেই। ছোট ক্যামেরার মতো দেখতে, তবে লেনসের জায়গায় একটা ছোট চোঙা রয়েছে।

চোঙার উলটো দিকটা মুখের কাছে এনে সুমা স্বাভাবিক স্বরে কথা বলল, আর সেই কথার তেজ শতগুণ বেড়ে আকাশ কাঁপিয়ে দিল।

তোমরা যদি ইংরিজি জান তো আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করো। আমরা মানুষ। তোমাদের বিষয় পড়ে তোমাদের সন্ধানে এসেছি।

পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে গুরুগভীর তেজস্বী কণ্ঠস্বরে উত্তর এল। এমন যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর মানুষের হয় না।

আমরা জানি তোমরা এসেছ। তোমরা কী ভাষায় কথা বলে সেটা জানার অপেক্ষায় ছিলাম।

আমরা তোমাদের বন্ধু বলল সুমা। আমরা তোমাদের কাছে আসতে চাই। কীভাবে আসব?

উত্তর এল, তোমরা রশ্মির উৎসের কাছে এসো। ততক্ষণে আমরা ব্যবস্থা করছি।

আমরা মনে প্রবল উত্তেজনা আর কৌতূহল নিয়ে আলোকসুস্তের দিকে এগিয়ে গেলাম।

কাছাকাছি যেতে আলো ক্রমশ স্তান হয়ে মিলিয়ে এল। কিন্তু তার পরিবর্তে সমস্ত জায়গাই একটা সাদা আলোয় আলোকিত হয়ে উঠল। আমরা অবাক হয়ে দেখলাম। এই আলোটাও সেই গর্তের ভিতর থেকেই আসছে।

আবার উদাত্ত যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

প্রবেশপথ দিয়ে চলন্ত সিঁড়ি নেমে এসেছে নীচে। তোমরা একে একে নেমে এসো। নীচে তোমাদের বসার ব্যবস্থা হয়েছে।

সবাই আমার দিকে চাইল। অর্থাৎ আমাকে দলপতি হতে হবে। আমি গর্তের দিকে এগিয়ে এলাম। নীচ থেকে আলো আসছে, তাতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে চলন্ত সিঁড়ি। আমি সিঁড়িতে পা দিতেই নীচে রওনা দিলাম, আমার পিছনে চারজন।

অন্তত পঞ্চাশ গজ নামার পর সিঁড়ির নীচে পৌঁছোলাম। সামনে বিশ হাত দূরেই দেখা যাচ্ছে একটা আলোকিত প্যাসেজ। এই প্যাসেজ ধরে মিনিটখানেক গিয়েই দেখি আমরা একটা গোল ঘরে পৌঁছেছি। এ ঘরও আলোকিত, কিন্তু কোথেকে আলো আসছে সেটা বোঝা যায় না। ঘরে ল্যাম্প জাতীয় কিছু নেই। ঘরের মাঝখানে একটা অজানা ধাতুর তৈরি সোনালি টেবিল, আর তাকে ঘিরে পাঁচটা সোনালি চেয়ার। আদেশ শোনা গেল; তোমরা বোসো। এই ঘর, এই আসবাব, তোমাদের জন্যই তৈরি করে রেখেছিলাম।

আমরা পাঁচজনে বসলাম। আবার কথা এল: মানুষ আমরা এই প্রথম দেখলাম। যেমন ভেবেছিলাম তার সঙ্গে কোনও পার্থক্য নেই। এতদিন যন্ত্রে তোমাদের কথা, তোমাদের গান, তোমাদের বাজনা শুনে এসেছি। এইবারে আসল মানুষকে দেখলাম।

কিন্তু তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না কেন? অসহিষ্ণুভাবে প্রশ্ন করল। সাবাটিনি। আমরা তোমাদের দেখতে চাই, তোমাদের কাছে আসতে চাই।

তা হবে না।

কেন?

আমাদের আকৃতি তোমরা সহ্য করতে পারবে না। আমরা দেখা দেব না। তোমরা কী জানতে চাও বলো।

তোমরা কি অন্য কোনও গ্রহ বা উপগ্রহ থেকে এসেছ?

না।

তবে?

পৃথিবীতে প্রাণীর সৃষ্টি হয়েছিল আকস্মিকভাবে-রাসায়নিক প্রক্রিয়ায়। আমাদেরও উৎপত্তি হয়েছে সেরকম আকস্মিকভাবেই। আজ থেকে তিনশো বছর আগে।

কিন্তু তোমরা এত অগ্রসর হলে কী করে-মানুষের সংস্পর্শে না এসেও?

আমরা অগ্রসর হয়েই জন্মেছি। এই তিনশো বছরে অবশ্য আমরা নিজেদের চেষ্টায় আরও উন্নত হয়েছি।

তোমরা মানে তোমরা সকলে?

হ্যাঁ। আমাদের পরস্পরে কোনও প্রভেদ নেই।

কতজন আছ তোমরা?

পনেরো হাজার। তবে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সংখ্যা ক্রমে বাড়ছে। ত্রিশ হাজার থাকতে পারে এই ভূগর্ভস্থিত শহরে।

তোমরা এই শহর তৈরি করলে কী করে? উপাদান কোথায় পেলো? তোমাদের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষানিরীক্ষার উপাদান কোথা থেকে পাও?

আমরা আমাদের ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে অনেক কিছু করতে পারি। কোনও কিছুর প্রয়োজন হলে আমরা সকলে মিলে একসঙ্গে সেটা পাবার ইচ্ছা করি। তার ফলে সেটা আমরা পেয়ে যাই। যেসব জিনিসের প্রয়োজন অল্পকালের জন্য, তার স্থায়িত্বও হয় অল্পকাল। যেমন এই চলন্ত সিঁড়ি। সিঁড়ির কোনও প্রয়োজন আমাদের হয় না। ওটা আমরা ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে শুধু তোমাদের প্রয়োজনের জন্য তৈরি করেছি। প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে ওটা আর থাকবে না। তা ছাড়া রসায়ন আমাদের সব ব্যাপারে সাহায্য করে।

প্রকৃতির সঙ্গে তোমাদের কী সম্পর্ক? ক্রোল জিজ্ঞেস করল।

কোনও সম্পর্ক নেই। আমরা জানি প্রকৃতির উপর নির্ভর করা বিপজ্জনক। পৃথিবীতে বহু জায়গায় বহুবার দুর্ভিক্ষ হয়েছে, তার কারণ অনাবৃষ্টির ফলে ফসলের অভাব। সেইরকম অতিবৃষ্টিতে বন্যা হয়েছে, মানুষের ঘর ভেসে গেছে, বহু মানুষ মরেছে। অর্থাৎ প্রকৃতি মানুষকে হতাশ করেছে, মানুষ তার জন্য কষ্ট পেয়েছে। আমাদের সে সমস্যা নেই।

তোমরা অবসর সময়ে কী করা? তোমাদের সংগীত নেই, খেলা নেই, সাহিত্য নেই?

আমাদের কোনও অবসরই নেই। আমরা সব সময়ই নিজেদের আরও অগ্রসর করতে চেষ্টা করি। আমরা যে স্তরে আছি, মানুষের সেখানে পৌঁছোতে আরও দুহাজার বছর লাগবে।

সন্ডার্স জিজ্ঞেস করল, হোয়াট অ্যা বাউট অ্যানিম্যালস, বার্ডস, ইনসেক্টস অ্যান্ড আদার ফর্মস অব লাইফ?

উত্তর এল; সেসব কিছু নেই। শুধু আমরা আছি আমাদের উন্নত জ্ঞান নিয়ে।

কিন্তু মশা তো রয়েছে তোমাদের দ্বীপে, বলল সন্ডার্স।

মশা?

হ্যাঁ। একরকম ইনসেক্ট। জান না?

এই প্রথম নাম শুনলাম।

আমি মনে মনে ভাবলাম—তা হলে এখানে চেয়ারে বসেও সাবাটিনি হাত চুলকোচ্ছে কেন? এখন মনে হচ্ছে যেন আসবার পথেও মাঝ সমুদ্রে সাবাটিনিকে মশা মারার চেষ্টা করতে দেখেছি। আমরা আসার পথে একটা দ্বীপে থেমেছিলাম। এঞ্জিনটাকে একটু বিশ্রাম দেবার জন্য। সেখান থেকেই মশার আমদানি হয়নি তো?

আমরা যাতে বসেছি, সেটা কী ধাতুর তৈরি? প্রশ্ন করল সুমা।

উত্তর এল; সোনা।

আশ্চর্য! পৃথিবীর সবচেয়ে বড় স্বর্ণখণ্ড হল তুতানখামেনের শবাধার। কিন্তু এই টেবিল তো তার চেয়ে অনেক বড়।

এখানে স্বর্ণখনি আছে? জিজ্ঞেস করল ক্রোল।

না। সোনা আমরা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তৈরি করি। আমাদের সব যন্ত্রপাতিই সোনার তৈরি। এখানে সোনার কোনও মূল্য নেই। আমরা জানি মানুষের মধ্যে আছে।

সাবাটিনি ধরা গলায় বলল, সোনা তৈরির ফরমুলা আছে তোমাদের কাছে?

নিশ্চয়ই। না হলে তৈরি হয় কী করে?

ক্রোল বলল, আমাদের তো একদিন না একদিন দেশে ফিরে যেতে হবে; তখন তো আমাদের এই অভিজ্ঞতার কথা কেউ বিশ্বাস করবে না। তোমাদের অন্তত একজন প্রাণীকে

কি আমরা সঙ্গে নিয়ে যেতে পারব না? অল্প কয়েক দিনের জন্য? তারপর আবার তাকে ফেরত দিয়ে যাব।

এবারে একটা হাসির শব্দ পাওয়া গেল। তারপর কথা এল—

সে যদি তোমাদের সঙ্গে যায়, তা হলে ফেরার কোনও সমস্যা নেই। যানবাহন ছাড়া চলাফেরা করার উপায় আমরা প্রথম থেকেই জানি।

তা হলে তোমাদের একজনকে দেবে আমাদের সঙ্গে?

বললাম তো—তার আকৃতি তোমরা সহ্য করতে পারবে না।

সে আকৃতি তোমরা বদলাতে পারবে না? এত কিছু পার, এটা পারবে না?

কিছুক্ষণের নিস্তব্ধতা। তারপর কথা এল—

আমাদের দুদিন সময় দাও। আজ বিদায়। যেভাবে এসেছি তোমরা সেভাবেই ফিরে যেতে পারবে।

ক্রোল বলল, কিন্তু একটা কথা তো জানা হয়নি।

কী?

আমরা যেমন মানুষ, তেমনি তোমাদের নাম কী?

সে নাম তোমাদের জিভে উচ্চারণ হবে না।

তা হলে ফিরে গিয়ে তোমাদের কী নামে উল্লেখ করব?

দু সেকেন্ড পরে উত্তর এল: অটোপ্লাজম।

আর এই শহরের নাম?

নোভোপলিস বলতে পার।

এবারে আমার একটা বলার ছিল, সেটা বলে নিলাম। প্রথমে জিজ্ঞেস করলাম, তোমাদের এখানে ব্যারাম নেই?

না।

তার মানে কোনও ওষুধও নেই?

না।

কিন্তু ব্যারামের সম্ভাবনা নেই সেটা কী করে বলছ? এর পরে যখন আসব। তখন আমার তৈরি ওষুধ মিরাকিউরলের বেশ কিছু বড়ি সঙ্গে করে এনে এই টেবিলের উপর রেখে দেব। যদি ব্যারাম হয়, তা হলে সেটা খেলে সেরে যেতে বাধ্য।

আমি অবশ্য ক্রিস্টোবান্ডির ভবিষ্যদ্বাণীর কথাটা ভেবেই এটা বললাম।

এরপরে আমরা গোলাঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলাম। এরা এয়ারকন্ডিশনিংটা ভালই রপ্ত করেছে, কারণ মাটির নীচে হলেও আমরা অতি আরামদায়ক ঠাণ্ডা উপভোগ করেছি।

সিঁড়ির কাছে এসে দেখি, সেটা এখন নীচ থেকে উপর দিকে যাচ্ছে।

বিচিত্র মনোভাব নিয়ে আমরা ক্যাম্পে ফিরলাম।

সাবাটিনি বলল, এখনও কিন্তু প্রমাণ পাওয়া যায়নি যে, এরা মানুষ নয়।

সেটা অবশ্য ঠিক, বলল ক্রোল।

এরা সবটাই মিথ্যে বলে থাকতে পারে। খাদ্যের সমস্যা এরা কীভাবে সমাধান করেছে। সেটা অবিশ্যি বোঝা গেল না। কিন্তু কৃত্রিম উপায়ে মাটির নীচে গাছপালা ফুল ফল সবই গজানো যায়।

আর সোনার ব্যাপারটা? সুমা জিজ্ঞেস করল।

সাবাটিনি একটা বিদ্যুপের হাসি হেসে উঠল।

তুমি কি বিশ্বাস করলে ওই চেয়ার টেবিল সোনার তৈরি?

গোল্ড হ্যাজ এ স্পেশাল কাইন্ড অব ম্মেল, বলল সুমা। আমি চেয়ার টেবিল থেকে সে গন্ধ পেয়েছি।

হোয়াট! সোনার গন্ধ! আমি এমন কথা কস্মিনকালেও শুনিনি।

আমি জানি। আমি জেনেশুনেই বলছি, ঈষৎ রাগতভাবে বলল সুমা।

আমি দুজনকে ঠাণ্ডা করলাম। তারপর বললাম, এরা মানুষই হোক আর নতুন প্রাণীই হোক, এরা যখন একশো বছর আগে লেসার রশ্মি আবিষ্কার করেছে, তখন এদের বিজ্ঞান যে অন্য মানুষের চেয়ে অনেক বেশি অগ্রসর সেটা স্বীকার করতেই হবে।

অক্টোবর ৬

আজ আমাদের অটোপ্লাজমদের ব্যাপারে কিছু করার নেই। আগামীকাল ওরা কী স্থির করল সেটা জানতে পারব। আমরা পাঁচজনে লোগোস খেলে আর সমুদ্রে স্নান করে সময় কাটালাম। আমার মন কিন্তু বলছে এরা মানুষ নয়, এবং এরা যা বলছে তা সবই সত্যি।

সন্ধ্যায় যথারীতি লেসারস্তু জ্বলে উঠল। আমরা এদের কাছ থেকে কোনওরকম খবর বা বিবৃতি আশা করছিলাম না, কিন্তু আলোকস্তু জ্বলার একটু পরেই পরিচিত কণ্ঠে ঘোষণা শুনলাম।

কাল আলো জ্বলার আধঘণ্টার মধ্যে তোমরা চলে এসো। যেমনভাবে এসেছিলে তেমনভাবেই আসবে, যে ঘরে বসেছিলে সে ঘরেই বসবে। কী সিদ্ধান্ত নিয়েছি সেটা তখনই বলব।

ঘোষণা বন্ধ হবার পর ক্রোল বলল, এমনও তো হতে পারে যে আমাদের দেশের কিছু বিজ্ঞানী দেশে আমল না পেয়ে জেদের বশে এখানে এসে ডেরা বেঁধেছে?

কিন্তু দেখলে তো এসক্যালেটর? বলল সন্ডার্স। এইসব জিনিস তৈরি করার জন্য তো নানারকম ধাতু, লোকজন, যন্ত্রপাতি ইত্যাদির প্রয়োজন। এসব এরা পেল কী করে?

ইচ্ছাশক্তির কথাটা ভুলো না সন্ডার্স? আমি মনে করিয়ে দিলাম। সত্যিই যদি এদের তেমন উইলপাওয়ার থাকে, তা হলে তার জোরে অনেক কিছুই সম্ভব।

দেখা যাক এরা কাল কী বলে, বলল সুমা।

অক্টোবর ৭

সন্ধ্যাবেলা লেসার রশ্মিটা কখন জ্বলে তার একটা আন্দাজ হয়ে গিয়েছিল আমাদের। আজ তাঁর আধঘণ্টা আগে রওনা হয়ে পৌঁছোবার ঠিক আগেই আলোকস্তুটা জ্বলে উঠল। তারপর কণ্ঠস্বর শোনা গেল : তোমরা চলে এসো।

আমরা চলন্ত সিঁড়ি দিয়ে নেমে আবার সেই গোলাঘরে গিয়ে হাজির হলাম।

কী স্থির করলে? প্রশ্ন করল ক্রোল।

আমাদের একজন লোক তোমাদের সঙ্গে দেব। তার আকৃতি হবে মানুষের মতো। পোশাকেও তোমাদের সঙ্গে কোনও তফাত করা যাবে না। কেবল বুদ্ধি হবে ওর আটোপ্লাজমের মতো।

ও কি ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করতে পারবে?

না; কারণ একজনের ইচ্ছাশক্তিতে কোনও ফল হয় না। তোমাদের জন্য চলন্ত সিঁড়িটা তৈরি করতে আমাদের পঞ্চাশজনের উইলপাওয়ার দরকার হয়েছিল।

তা হলে তো আর বেশিদিন এখানে থেকে লাভ নেই বলল সভাস। আমরা পরশুই সকালে বেরিয়ে পড়তে পারি।

কাল তোমরা তা হলে এই সময়েই এসো।

ঠিক আছে।

অক্টোবর ৯

আমরা আজ সকাল সাড়ে আটটায় রওনা হচ্ছি। চটপট কালকের ঘটনাটা বলে নিই।

কাল সন্ধ্যায় আবার সেই গোলাঘরে গিয়ে পৌঁছোতে কথা শোনা গেল।

তোমরা যেই পথ দিয়ে এলে, সেই পথ দিয়েই আমাদের প্রতিভূ। তোমাদের কাছে যাচ্ছে। একে তোমরা অ্যাডাম বলে ডেকে। কারণ এ আমাদের তৈরি প্রথম মানুষ। আবুজরুরি কথা তোমাদের মনে রাখতে হবে।

কী?

তোমাদের এখান থেকে দেশে ফিরতে কত দিন লাগবে?

তিন সপ্তাহ পরে আমরা লন্ডনে পৌঁছেবি।

যেদিন পৌঁছোবে, সেদিন থেকে ধরে সাত দিনের জন্য অ্যাডাম মানুষের আকৃতি নিয়ে থাকতে পারে। সাত দিন শেষ হলেই সে আপনিই আমাদের এখানে ফিরে আসবে। আমার বিশ্বাস তারমধ্যে তোমাদের কাজ হয়ে যাবে। ওকে তোমরা আসতে বাধা দিও না। মনে রেখে—ও বলপ্রয়োগ করে কিছু করতে পারবে না। অটোপ্লাজম অহিংস প্রাণী। অ্যাডাম নিরস্ত্র অবস্থায় যাচ্ছে তোমাদের সঙ্গে।

যদি দেরি হয়ে যায় তা হলে কী হবে?

তার ফল ভাল হবে না। এর বেশি আমি আর কিছু বলব না। আমি লক্ষ করছি তোমরা কেউ কেউ হাতে আংটি পর। আমি অ্যাডামের হাতে পাঁচটা সোনার আংটি পাঠিয়ে দিচ্ছি—পিওর গোল্ড; টুয়েন্টি-ফোর ক্যারাট। তোমরা সেগুলি গ্রহণ করলে খুশি হব।

জুতোর শব্দ পেয়ে পিছনে ফিরে দেখি, আমরা যে পথ দিয়ে এসেছি। সে পথ দিয়ে একজন সুদর্শন শ্বেতাঙ্গ যুবক প্রবেশ করল।

গুড ইভনিং জেন্টলমেন, মাই নেম ইজ অ্যাডাম।

ক্রোল যেন বেশ অবাক হয়েই বলল, কিন্তু তুমি আসলে এখানকার প্রাণী তো?

ইয়েস। আই অ্যাম অ্যান অটোপ্লাজম।

তোমাকে কিন্তু আমাদের দেশের বিজ্ঞানীরা নানারকম প্রশ্ন করবে। তুমি তার জবাব দিতে পারবে তো?

আমার বিশ্বাস আমি পারব।

তা হলে কাল সকালে আমরা আমাদের দেশে ফিরে যাচ্ছি। আজ রাতটা তুমি প্রোফেসর সাবাটিনির ক্যাম্পে ঘুমোবে।

আমরা ঘুমোই না।

যাই হোক, কাল সকালে আমরা রওনা দেব। লন্ডন শহরে সাত দিন থেকে তুমি আবার তোমার দেশে ফিরে আসবে।

সবশেষে আমি পকেট থেকে একটা বড় বোতলে রাখা এক হাজার মিরাকিউরলের বড়ি টেবিলের উপর রেখে বললাম, এই রইল ওষুধ। আশা করি তোমাদের কোনও ব্যারাম হবে না। কিন্তু যদি হয়, তা হলে এই ওষুধ খেলে বুঝতে পারবে যে মানুষও একেবারে পিছিয়ে নেই।

সন্ডার্স ডাকছে। সুমাত্রাফট রেডি।

অক্টোবর ১১

এই দুদিন দেখে বুঝেছি অ্যাডাম ছেলেটি অত্যন্ত ভদ্র। আমাদের সকলকে সমীহ করে চলে। সেইসঙ্গে এটাও দেখছি যে লোগোস খেলায় তার মতো অসাধারণ ক্ষমতা আমাদের আর কারুর মধ্যে নেই। ও আমাদের চেয়ে এত বেশি ভাল যে, শেষে খেলা বন্ধ করে দিতে হল। এখন আমরা গল্পগুজব করে আর সুমার ক্যাসেটে বাজনা শুনে সময় কাটিয়ে দিচ্ছি।

সুমার ভিডিও ক্যামেরা ছিল, কিন্তু সেটা সে বারই করেনি। যদিও আমাদের সঙ্গে একটি অটোপ্লাজম চলেছে, তার সঙ্গে মানুষের কোনও তফাত নেই দেখে সুমা ছবি তোলার উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছে।

আমি অনেক ভেবে একটা সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছি। সেটা হল—এরা যদি সত্যিই মানুষ না হয়, তা হলে এরা যতই উন্নত প্রাণী হোক না কেন, সুখ দুঃখ সকাল সন্ধ্যা চন্দ্র সূর্য ফুল ফল রং রস খেলাধুলা পশু পাখি নিয়ে মানুষই ভাল।

নভেম্বর ২, লন্ডন

আমরা কাল এখানে এসে পৌঁছেছি। আজ অ্যালবার্ট হলে পঞ্চাশ জন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী আর দুহাজার দর্শকের সামনে অ্যাডাম তার পরীক্ষা দিল।

প্রথমেই সুইডেনের বিখ্যাত গণিতজ্ঞ হানস রুডেলবার্গকে অ্যাডাম ধরাশায়ী করল। রুডেলবার্গের সদ্যপ্রকাশিত কিছু গাণিতিক তথ্য অ্যাডাম প্রমাণ করে দিল যে, তাদের দেশে সত্তর বছর আগে থেকে সকলেই জানে। তারপর সে কতকগুলো তথ্যের উদাহরণ দিল, যেগুলো আমাদের গাণিতিকরা এখনও উদ্ভবই করেননি।

এবার লন্ডনের জীবতত্ত্ববিদ ডক্টর কিংকেড মঞ্চে উঠে অ্যাডামকে উদ্দেশ্য করে বললেন, বুঝতেই পারছি আপনাদের বিজ্ঞান খুবই উন্নত, কিন্তু আপনারা নিজেদের মানুষ নয় বলে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করছেন কেন? আকৃতিতে তো আপনার সঙ্গে আমাদের একটি যুবকের কোনও পার্থক্য দেখতে পাচ্ছি না। আপনি বলছেন, আপনাদের দ্বীপে আপনা থেকেই প্রাণীর উদ্ভব হয়েছিল; কিন্তু তার চেহারা মানুষের মতো কী করে হয়?

অ্যাডাম অত্যন্ত নম্রভাবে জানাল যে এটা তার আসল চেহারা নয়। আমাদের চেহারায় মানুষ অভ্যস্ত নয় বলে আমি মানুষের আকৃতি নিয়ে এসেছি।

দেড় ঘণ্টা চলল ব্যাপারটা। প্রোফেসর ম্যাংকিভিচ, প্রোফেসর বুনিয়াস, জন ডাকওয়ার্থ, ডক্টর ভ্যাসিলিয়েফ, রিখটার গুলৎস ইত্যাদি ইত্যাদি বাঘা বাঘা পদার্থবিজ্ঞানী, প্রত্নতাত্ত্বিক, জীববিজ্ঞানী, গণিতজ্ঞ, উদ্ভিদবিজ্ঞানী সকলেই অ্যাডামের কাছে হার স্বীকার করলেন। অ্যাডাম যথারীতি ভদ্র ও বিনীতভাবে তাঁদের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিল। অবশেষে যিনি আজকের অনুষ্ঠানের সভাপতি-প্রোফেসর কার্টওয়েল-তিনি বললেন, আমরা একজন অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন ও পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানীর চেয়ে অনেক বেশি অগ্রসর ব্যক্তির পরিচয় পেয়ে চমৎকৃত হয়েছি। এবং নিজেদের ভাগ্যবান মনে করছি। আজকের দিনটি যে বিজ্ঞানের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু মিস্টার

অ্যাডাম তাঁর আসল আকৃতি আমাদের কাছে প্রকাশ করলেন না, ফলে একটা সন্দেহ রয়ে গেল যে তিনি আসলে মানুষ, এবং মানুষ হয়েই বিজ্ঞানের চূড়ান্ত সীমানায় পৌঁছেছেন।

করধ্বনিতে অ্যালবার্ট হল ফেটে পড়ল।

আমরা অ্যাডামকে নিয়ে হোটেলে ফিরে এলাম। সামনের তিন দিন ওকে ব্যস্ত থাকতে হবে : সাংবাদিক সম্মেলন আছে, গোটাতিনেক টেলিভিশনে সাক্ষাৎকার আছে। আমি বারবার সকলকে মনে করিয়ে দিচ্ছি যে, ৭ই সপ্ত্যার মধ্যে ওকে ছেড়ে দিতে হবে।

সাবাটিনি অন্য হোটেলে রয়েছে, সে একদিন অ্যাডামকে খাওয়াতে চায়। খাওয়ার ব্যাপারে অ্যাডামকে নিয়ে কোনও সমস্যা নেই। তাকে এমনভাবে তৈরি করে দেওয়া হয়েছে যে, সে দিব্যি মানুষের খাদ্য খেয়ে হজম করছে।

ঠিক হল পরশু, অর্থাৎ ৪ঠা নভেম্বর, সকালে টেলিভিশন ইন্টারভিউ-এর পর সাবাটিনি অ্যাডামকে তার হোটেলে নিয়ে যাবে খাওয়ানোর জন্য। সাবাটিনি বলল যে তার দু-তিনটে সিটিং লাগবে অ্যাডামের সঙ্গে, কারণ ম্যাড্রিড ফিরে গিয়ে সে ওখানকার স্প্যানিশ কাগজে অটোপ্লাজম সম্বন্ধে বড় করে লিখতে চায়।

নভেম্বর ৪

কাল সাংবাদিক সম্মেলনের ফলে আজ সব খবরের কাগজে বিস্তারিতভাবে অ্যাডামের খবর বেরিয়েছে। তার চেহারা যে হুবহু মানুষের মতো, তাতে অটোপ্লাজম সম্বন্ধে অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করেছে। তবে এটা সকলেই বলেছে যে, এমন একটি অসাধারণ মেধাবী যুবকের এইভাবে আত্মপ্রকাশ একটি যুগান্তকারী ঘটনা।

আমরা অ্যাডামকে যথাসম্ভব। আগলে রাখছি। সাবাটিনি ওকে নিয়ে যেতে চাইলেও আমরা সে ব্যাপারে খুব উৎসাহ প্রকাশ করছি না। আরেকটা সিটিং সাবাটিনিকে দিতেই

হবে, ও হোটেলে ডিনারের পর। সাক্ষাৎকারের পর সাবাটিনি বলেছে, সে নিজেই অ্যাডামকে আমাদের হোটেলে পৌঁছে দিয়ে যাবে।

নভেম্বর ৬

ক্রোল, সন্ডার্স এবং আমি-তিনজনেই গভীর উদ্বেগের মধ্যে রয়েছি।

কাল রাতে ডিনারের পর সাবাটিনির কাছ থেকে অ্যাডাম আমাদের হোটেলে ফেরেনি। সাবাটিনি যে এতটা দায়িত্বজ্ঞানহীন সেটা আমি বুঝিনি। আজ সকালে ওর হোটেলে ফোন করে জানলাম যে, সাবাটিনি আজ ভোরে হোটেল ত্যাগ করে অন্যত্র চলে গেছে। আমরা তিন জন বহু হোটেলে টেলিফোন করেও সাবাটিনির সন্ধান পাইনি। অথচ কাল সাত তারিখ। কাল সন্ধ্যায় অ্যাডামকে ছেড়ে দিতে হবে। আজ একটা খবরের কাগজ থেকে একটা বিশেষ সাক্ষাৎকারের জন্য ফোন করেছিল; তাকেও না করে দিতে হয়েছে।

আজকে আশা করি কোনও সময় সাবাটিনি না হোক, অন্তত অ্যাডাম ফিরে আসবে।

নভেম্বর ৭

ভয়ংকর ঘটনা। এখনও তার জের কাটিয়ে উঠতে পারিনি। সন্ডার্স অনেক অনুসন্ধানের পর জানতে পারে যে, লন্ডনের বাইরে সাসেক্সে সাবাটিনির এক বন্ধু থাকেন। তিনিও স্প্যানিশ, লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে স্প্যানিশ শেখান। সন্ডার্সের বিশ্বাস; সেখানে সাবাটিনি এবং অ্যাডাম-দুজনেরই খোঁজ পাওয়া যাবে।

আমি বললাম, তা হলে এক্ষুনি চলো। এখন সোয়া তিনটে। আজ সাড়ে ছটার মধ্যে অ্যাডামকে নোভোপলিস ফিরতে হবে।

ঠিকানা অবশ্যই সন্ডার্স জোগাড় করে এনেছিল। আমরা যখন যথাস্থানে হাজির হলাম, তখন প্রায় সন্ধ্যা। দোতলা বাড়ি, সামনে একটা ছোট বাগান। সামনের দরজায়

বেল টিপতে একজন চাকর এসে দরজা খুলেই বলল, প্রোফেসর আলভারেজ শহরে নেই, প্যারিসে গেছেন।

আমরা প্রোফেসর সাবাটিনির খোঁজ করতে এসেছি। বলল ক্রোল।

উনি ব্যস্ত আছেন।

তা হোক। আমাদের ওঁর সঙ্গে বিশেষ দরকার।

কথাটা বলতে বলতেই ক্রোল গায়ের জোরে চাকরকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল।

চাকর আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলল, ওপরে যাবার হুকুম নেই।

নিশ্চয়ই আছে, ক্রোল তার রিভলভার বার করে চাকরের দিকে তাগ করে বলল।

কিন্তু... কিন্তু ওনার ঘরের দরজা বন্ধ।

কোথায় ঘর?

দোতলায়, কাঁপতে কাঁপতে বলল চাকর।

আমরা দোতলায় উঠে গিয়ে ডানদিকে একটা বন্ধ দরজা দেখলাম। ক্রোল তাতে ধাক্কা দিল। একবার, দুবার। কোনও ফল হল না। সাবাটিনি! সাবাটিনি! গলা চড়িয়ে বলল ক্রোল।

কোনও উত্তর নেই।

এবার ক্রোল দরজার কাছে মুখ এনে বলল, সাবাটিনি, শেষবারের মতো বলছি। দরজা খোলো, না হলে আমরা দরজা ভেঙে ঢুকব।

তাতেও যখন কোনও ফল হল না। তখন ক্রোল দরজার অগলের দিকে তাগ করে রিভলভারের ঘোড়া টিপে দিল। প্রচণ্ড শব্দের সঙ্গে দরজা ফাঁক হয়ে গেল, আর আমরা তিন জন ছড়মুড়িয়ে ঘরের ভিতর ঢুকলাম।

আশ্চর্য দৃশ্য। দুটো মুখোমুখি চেয়ার—একটাতে আমাদের দিকে পিঠ করে বসে আছে সাবাটিনি, অন্যটায় হাত পা দড়ি দিয়ে বাঁধা অবস্থায় অ্যাডাম।

আমাদের ঢুকতে দেখে সাবাটিনি অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে মুখ বিকৃত করে বলল, আর দু মিনিটের মধ্যে আমি জেনে ফেলতে পারতাম, আর তোমরা সব ভণ্ডুল করে দিলে।

কী জেনে ফেলতে? জিজ্ঞাসা করল। সন্ডার্স।

দ্য ফরমুলা ফর মেকিং গোল্ড! ঘর কাঁপিয়ে বলল সাবাটিনি।

আমি কোনওদিনও বলতাম না, দৃঢ়স্বরে বলল অ্যাডাম। নেভার, নেভার, নেভার—

এই তৃতীয় নেভার-এর সঙ্গে একটা অদ্ভুত ব্যাপার হল। অ্যাডামের সুপুরুষ আকৃতি কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে বদলে গিয়ে তার বদলে সেখানে এক বিকটদর্শন চোখসর্বস্ব দাঁতসর্বস্ব, নখসর্বস্ব প্রাণীর আবির্ভাব হল। এমন ভয়ংকর কোনও আকৃতি কল্পনাও করা কঠিন। সাবাটিনি সেটা দেখেই অজ্ঞান হয়ে চেয়ার থেকে মেঝেতে পড়ে গেল। ক্রোল মাইন গট!—বলে আর্তনাদ করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। এক সন্ডার্সেরই দেখলাম আশ্চর্য সাহস। সে ঘরে থেকে গিয়ে বলল, বাঁধনগুলো খুলে দাও, শঙ্কু।

আমি এগিয়ে গিয়ে প্রাণীর হাত আর পায়ের বাঁধন খুলে দিলাম। প্রাণীটা রক্তবর্ণ বিশাল চোখ আমাদের দিকে ঘুরিয়ে বলল, থ্যাঙ্ক ইউ।

তারপর প্রাণীটা তার লোমশ সরু সরু পায়ে দাঁড়িয়ে উঠে বলল, টেলিপ্যাথিতে আমার সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছিল আমাদের দেশের প্রাণীর সঙ্গে। মশা থেকে আমাদের

সত্যজিৎ রায় । ডন ফ্রিস্টোবাভির ভবিষ্যদ্বাণী । প্রোফেসর শম্ভু

দেশে ব্যারাম দেখা দিয়েছে। মনে হয় তোমার ওষুধ না হলে কেউই বাঁচত না।-আমি তা হলে আসি।

শেষ কথাটার সঙ্গে সঙ্গে প্রাণীটা অদৃশ্য হয়ে গেল।

আমি মনে মনে বললাম, ক্রিস্টোবাভির ভবিষ্যদ্বাণী নির্ভুল প্রমাণিত হল।

আনন্দমেলা। পূজাবার্ষিকী ১৩৯৬